বিশ্ব পরিবেশ দিবসের (৫ জুন) প্রাক্কালে সংবাদ সম্মেলন, ৪ জুন ২০১৮, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।

কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষার স্বার্থে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে দ্রুত প্রত্যাবর্তন ও স্থানান্তর করতে হবে

কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সম্পদ পুনরুদ্ধারে পৃথক তহবিল চাই

পটভূমি

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে সামরিক জান্তার নেতৃত্বে সংঘটিত গণহত্যা ও ধর্ষন থেকে বাঁচতে গত ২৫ আগস্ট ২০১৭-এর পর ৬৭১,৫০০ (আইএসসিজি প্রতিবেদন ২৫ মার্চ ২০১৮) রোহিঙ্গা সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার বিভিন্ন অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরে তারা আশ্রয় গ্রহন করে। এর পূর্বে ১৯৯২ সাল থেকে চলমান এবং প্রায় স্থায়ী হয়ে যাওয়া শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের সংখ্যা ২১২,৫১৮। সব মিলিয়ে এই দুই উপজেলায় শরণার্থীর সংখ্যা ৮৮৩,৮৬৮ জন। সারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শরণার্থী আশ্রয়দাতা দেশের তালিকায় বাংলাদেশ এখন ৬ষ্ঠ।

মানবিক বিপর্যয়

নিউইয়র্ক টাইমসে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, রাখাইন প্রদেশে মায়ানমার মিলিটারি ও অন্য সশস্ত্র গ্রুপ ৬,৭০০ রোহিঙ্গাকে হত্যা করে যার মধ্যে কমপক্ষে ৭৩০ ছিল শিশু। ধর্ষন হয়েছে অগনিত। যার কারণে এই প্রায় দশ লক্ষ রোহিঙ্গা তাদের ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার ও জীবিকার সংস্থান ছেড়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহন করেছে। সারা পৃথিবীর মানুষ একে চরম মানবিক বিপর্যয় বলে আখ্যায়িত করেছে।

বিপর্যস্ত নারী ও শিশুসহ দশ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষার্থে মানবিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ সরকার এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে মিলে তাদের খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ও অন্য কিছু মৌলিক সেবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই সেবা কোনোভাবেই মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

দুর্যোগে লক্ষ প্রাণের ঝুঁকির আশঙ্কা

প্রায় ১ মিলিয়ন মানুষ আশ্রয় নিয়েছে খুবই অস্থায়ীভাবে তাড়াহুড়ায় তৈরি করা পলিথিনের তাঁবুর মধ্যে। তীব্র গরমে বিশেষ করে শিশুদের পক্ষে সেখানে টিকে থাকা খুবই কঠিন। সামান্য ঝোড়ো বাতাসেও পলিথিনের তাঁবু উড়ে যাবে। যেসব পাহাড়ে শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া হয়েছে সেখানে ইতিমধ্যে প্রায় সকল গাছ কাটা পড়েছে। ঘাস উঠে গেছে। ফলে, আগামী বর্ষা মৌসুমে পাহাড় ধস ও ব্যাপক প্রাণহানীর ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়াও আছে এই অঞ্চলের ঘুর্ণিঝড় প্রবণতার ঝুঁকি। সব মিলে মাত্র ৫,৮০০ একর জমিতে (২৩.৪ বর্গকিলোমিটার) অবস্থান নিয়েছে ১ মিলিয়ন মানুষ- প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩৭,৭৭২ জন। পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। এই ঘনবসতি কোনোভাবেই মানবজীবনের উপযোগী নয়। পরিবেশের জন্যও তা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।

কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সম্পদে রোহিঙ্গা শরণার্থী ঢলের প্রভাব

২৫ আগস্টে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রবেশের পর ৯ মাস অতিবাহিত হয়েছে। ইতিমধ্যে কক্সবাজারের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক জীবনে এই বিপুল সংখ্যক মানুষের অপরিকল্পিত ও অমানবিক অবস্থায় বসবাসের নানা প্রভাব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত প্রভাব ইতিমধ্যে এমন অবস্থায় গিয়েছে যা সহজে পরিপূরণ যোগ্য নয়। তার কিছু বিবরন নিচে তুলে ধরা হলো।

২০১৯ সালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বনভূমি

উখিয়া উপজেলার মোট আয়তনের প্রায় ৬০% হচ্ছে বনভূমি, আর টেকনাফে তা ৪১%। বাংলাদেশে সুন্দরবন এবং খাগড়াছড়ি-বান্দরবানের কিছু অংশ ছাড়া এতটা নিবিড় বনভূমি আর কোথাও নাই। এই বনভূমির একটা নিজস্ব প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান ছিল যা ইতিমধ্যে ভেঙে পড়েছে। হাতির আবাসভূমি ও চলাচলের পথ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। অধিক মানুষের উপস্থিতি সাধারণত পাখি ও অন্যান্য বন্য প্রাণীকে স্থানান্তরে বাধ্য করে।

শুধুমাত্র রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া ১৯৪,০০০ পরিবারের রান্নার জন্য প্রতিদিন ২,২৫০ টন জ্বালানি কাঠ পুড়ছে (কোস্ট ট্রাস্ট পরিচালতি গবেষণা)। এই কাঠ সংগৃহীত হচ্ছে নিকটস্থ বনভূমি থেকে। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিবরণ অনুযায়ী, প্রতিদিন ৪টি ফুটবল মাঠের সমান বনভূমি উজার হয়ে যাচ্ছে। এই হারে চলতে থাকলে ২০১৯ সালের মধ্যে উখিয়া ও টেকনাফে আর বনভূমি বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। উল্লেখ্য, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে ইনানী পর্যন্ত বিস্তৃত বনভূমি শেষ হতে বাকি আছে আর মাত্র ৫ কিলোমিটার।

ভূ-উপরিস্থিত পানি দূষিতঃ শেষ হয়ে যাচ্ছে ভূ-গর্ভস্থ পানি

উখিয়া ও টেকনাফে অবস্থিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর আশে পাশে অবস্থিত এবং সংযুক্ত মোট ২১টি খাল, ছড়া ও ঝিরির সবগুলোর পানি দূষিত হয়ে গেছে। যে পানির উপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ মানুষ কৃষি ও পারিবারিক দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করত। এখন তাদের জন্য আর বিকল্প কোনো পানির উৎস অবশিষ্ট নাই।

ভূগর্ভস্থ পানির স্তরও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অপরিকল্পিত ভাবে যত্রতত্র গভীর-অগভীর নলকূপ বসানোর ফলে পানির প্রথম একাধিক স্তর পানিশূন্য হয়ে পড়েছে। কোস্ট ট্রাস্ট পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, ৪টি ক্যাম্পের ৫০টি ব্লকে প্রায় ৩০০ নলকূপের মধ্যে ৭০% আর পানি পাচ্ছে না। কোস্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে বসানো ১০টি গভীর নলকূপের (৬৮০ থেকে ১০০০ ফুট পর্যন্ত) প্রতিটি কমপক্ষে আরো ৩০-৪০ ফুট করে গভীরতা বাড়ানো হয়েছে। যার অর্থ, পানির স্তর দ্রুত নিচে

নেমে যাচ্ছে। টেকনাফে এই পরিস্থিতি আরো তীব্র। গণস্বাস্থ্যসহ বেশ কয়েকটি সংস্থা সেখানে গভীর নলকূপ বসিয়েও পানি পায়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টেকনাফের ভূগর্ভস্থ ওয়াটার টেবিল ইতিমধ্যে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত, যা আগামী ৫০ বছরেও সমাধানযোগ্য নয়।

দূষণে মৃতপ্রায় ২১টি খাল ও ছড়া: মানববর্জ্য ছড়াচ্ছে রোগ

মানববর্জ্য দ্বারা ইতিমধ্যে ক্যাম্পের নিকটস্থ সকল কৃষিজমি মারাত্মক দূষণের শিকার হয়ে চাষঅযোগ্য হয়ে পড়েছে। উখিয়াতে ১৩০ হেক্টর এবং টেকনাফে ২৫০ হেক্টর জমিতে আগামী মৌসুমে আর চাষাবাদ করা সম্ভব হবে না। উখিয়ার ভাঙ্গারি ব্যবসায়ীরা প্রতি মাসে ১০০ টন পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য (যেমন, প্লাস্টিকের বোতল, টিন, লোহা ইত্যাদি) ক্যাম্পগুলো থেকে সংগ্রহ করে নিচ্ছেন। তবে তারা অন্যান্য বর্জ সংগ্রহ করছেন না। বিশেষ করে প্রতিদিন ফেলে দেয়া বিপুল পরিমাণ পলিথিন, প্লাস্টিকের প্যাকেট খাল ও ছড়াগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে। বিপুল সংখ্যক টয়লেট যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে ও অপরিকল্পিত অস্থায়ীভাবে বসানোর ফলে উপচে পড়ছে, বন্ধ হয়ে গেছে এবং দুর্গন্ধ ও রোগ জীবানু ছড়াচ্ছে। মানবস্বাস্থ্যের জন্য যা মারাত্মক ক্ষতিকর।

জনবসতির অস্বাভাবিক ঘনত্ব (ডেমোগ্রাফিক ইমব্যালেন্স)

উখিয়া ও টেকনাফের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ২০৭,৩৭৯ এবং ২৬৪,৩৮৯ (২০১১ আদমশুমারি)। কিন্তু আশ্রয় গ্রহন করা শরণার্থীর সংখ্যা হিসাবে নিলে দুই উপজেলার মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১,৩৫৫,৬৩৬। স্থানীয় অধিবাসী নিজ ভূখণ্ডে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে গেছে (তারা এখন মোট জনসংখ্যার ৩৫%)। একটি নির্দিষ্ট ভুখন্ডে জনসংখ্যার এই রাতারাতি পরিবর্তন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

উখিয়ার জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৯২ জন, যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৪৬৮ তে। বৃদ্ধির হার ৪৩৮%। শহরের মতো এখানে বহুতল ভবন বা অন্যান্য নাগরিক ব্যবস্থাপনা নেই যে এই জনপদ এতটা জন-ঘনত্ব বহন করতে পারবে। ইতিমধ্যে এভাবে ৯ মাস অতিবাহিত হয়েছে। যদি এভাবে আর এক বছর অতিবাহিত হয়, জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক ঘনত্ব পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করবে। অবিলম্বে এই অস্বাভাবিক ঘনত্ব হ্রাস করা (decongestion) না গেলে কক্সবাজারে মানবিক বিপর্যয় ঘটতে পারে।

কৃষি, শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষতি

উখিয়াতে ইতিমধ্যে ১০০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। দূষণের কারণে জমি পতিত হয়ে পড়েছে দুই উপজেলা মিলে প্রায় ৩৮০ হেক্টর। ত্রাণকাজে স্কুলভবন দখল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যাপক হারে ত্রাণকাজে যোগদান, যানবাহনের ভিড় ও নিরাপত্তার অভাবে স্কুলে অস্বাভাবিক অনুপস্থিতি দেখা দিয়েছে। স্থানীয় একটি কলেজে পরীক্ষার সময় বার বার পেছাতে হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে হাসপাতালে অতি ভিড়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও রোগ সংক্রমণ ইত্যাদি মিলে উখিয়া ও টেকনাফের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য খাতে অত্যন্ত বিরুপ প্রভাব পড়েছে। দুই উপজেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫% নানাভাবে বননির্ভর জীবিকায় অভ্যস্ত ছিল, যা এখন পুরোপুরি বন্ধ। দিনমজুরি মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ায় দারিদ্র বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সম্পদ পুনরুদ্ধারে আমাদের সুপারিশ

১। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে তাদেরকে অবিলম্বে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য মায়ানমার সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় তার জন্য সময় লাগলে, কক্সবাজারের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের স্বার্থে শরণার্থীদের দ্রুত অন্যত্র স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। কক্সবাজারে সৃষ্ট অস্বাভাবিক জনঘনত্ব হ্রাস (decongestion) করতে হবে।

২। কক্সবাজারের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদে ইতিমধ্যে যে ক্ষতি হয়েছে তা পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ তহবিল বরাদ্দ করতে হবে। রোহিঙ্গা রিলিফের জন্য আন্তর্জাতিক বাজেটের একটা অংশ এই খাতে বরাদ্দ করতে হবে।

৩। কালবিলম্ব না করে সকল শরনার্থী পরিবারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রান্নার জন্য বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

৪। ভূ-উপরিস্থিত পানির দূষণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং সকল খাল, ছড়া ও ঝিরিগুলোতে পানির প্রাকৃতিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। কক্সবাজার জেলায় ভূ-উপরিভাগে পুকুর ও খাল খনন করে পানির সঞ্চয় বাড়াতে হবে।

৫। ভূ-গর্ভস্থ পানি একটি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। এর অপরিকল্পিত ব্যবহার ভবিষ্যতের জন্য মারাত্মক হুমকি বয়ে আনতে পারে। টেকনাফে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার অবিলম্বে সীমিত করতে হবে এবং এ ব্যাপারে একটি সমন্বিত নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

৬। শরণার্থী শিবিরগুলোতে তথা কক্সবাজার জেলায় ব্যাপক বৃক্ষরোপন কার্যক্রম এই বর্ষায় চালু করতে হবে। বৃক্ষরোপনের সময় শুধু এক প্রজাতির গাছ না লাগিয়ে বৈচিত্রপূর্ণ ও ফলজ বৃক্ষ রোপন করতে হবে।

৭। আসন্ন ও দীর্ঘমেয়াদী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে (উদাহরণ স্বরূপ, স্কুল ভবনগুলোকে সাইক্লোন শেল্টারের উপযোগী করে পুনর্নির্মাণ করতে হবে)।

কোস্ট ট্রাস্ট ও কক্সবাজার সিএসও-এনজিও ফোরাম
সচিবালয়: বাড়ি ১৩, (মেট্রো মেলডি), সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা। ফোন: ০২-৫৮১৫০০৮২, ৯১২৬১৩১ ইমেইল: info@coastbd.net
ওয়েব সাইট: www.cxb-cso-ngo-org, www.coastbd.net